বেঙ্গল টাইমস
৮ আগস্ট, ২০২৬

ই-ম্যাগাজিন

ঘরে ফেরা

তসলিমা নাসরিনের কলকাতা সফর

"কলকাতা—
স্মৃতি, অনুভব
আর এক অমলিন টান"

bengaltimes.in

ISBN
2445 5657

সম্পাদকীয়

স্বাগত, আবার উদ্বিগ্নও

প্রায় দুই দশক আগে তিনি চলে গিয়েছিলেন। বলা ভাল, তাঁকে চলে যেতে হয়েছিল। নিজের দেশ থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন আগেই। বুক দিয়ে আঁকড়ে ধরেছিলেন কলকাতাকে। সেই শহরও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। কল্লোলিনী তিলোত্তমার কাছে সেটা মোটেই ভাল বিজ্ঞাপন ছিল না।

মাঝের পনেরো বছরেও তাঁকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হয়নি। দরজা বন্ধই ছিল। অবশেষে, সেই বন্ধ দরজা খুলল। দীর্ঘ ১৯ বছর পর এই বাংলায় তাঁর প্রত্যাবর্তন। প্রাথমিকভাবে সরকারকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়। সরকার অন্তত সদিচ্ছা দেখিয়েছে।

কিন্তু এই বাংলা মুক্তচিন্তার পীঠস্থান হয়ে উঠেছে, এমনটা বলার মতো সময় আসেনি। তসলিমা শুধু এক লেখিকা নন, তিনি মুক্তচিন্তার এক প্রতিনিধি। প্রগতিশীলতার এক জ্বলন্ত মশাল। ধর্মীয় গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে থাকা এক মানুষ। কিন্তু একদিকে তাঁকে সংবর্ধনার আয়োজন, অন্যদিকে মুক্তচিন্তার কণ্ঠরোধ, দুটোই কিন্তু পাশাপাশি চলছে। একটু ভিন্নমত হলেই 'হিন্দু-বিরোধী', 'দেশ বিরোধী' তকমা এঁটে দেওয়া হচ্ছে। পাড়ায় যেমন একটি উন্মত্ত শ্রেণি তৈরি হয়েছে, তাঁরাই ঢুকে পড়ছে শিক্ষাঙ্গনেও। ভিন্নমত গ্রহণ করা তো দূরের কথাস, শোনার মতো সহিষ্ণুতাটুকুও এঁদের নেই।

তার চেয়েও যেটা বিপজ্জনক, তা হল এইসব অসহিষ্ণুতা প্রশাসনের দিক থেকে কোথাও প্রশ্রয় পেয়ে যাচ্ছে। এঁরা বুঝে গেছেন, প্রশাসন কিছুই করবে না। তাই কখনও অ্যাকাডেমির রঙ গেরুয়া করে দিচ্ছেন, কখনও ফিল্ম জগতে ঘুরপথে ঢুকে পড়ছেন। কখনও বইমেলা দখলের হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে। তসলিমা ফিরে এলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁকে বরণ করে নেওয়ার জন্য কলকাতা আজও প্রস্তুত নয়। বরং, অসহিষ্ণুতা বেড়েছে বই কমেনি। সেদিনই তসলিমা মঞ্চে ডেকেছিলেন বাংলার অগ্রগণ্য কবি জয় গোস্বামীকে। যেভাবে বিক্ষোভ দেখানো হল, সেটাকে বিক্ষোভ না বলে 'অসভ্যতা' বলাই ভাল। এই অসভ্যতাকে সমর্থন করার লোকও জুটে গেল। তাঁদের কেউ মন্ত্রী, কেউ বিধায়ক, কেউ সাংসদ।

এঁরা কবি জয় গোস্বামীর কবিতা পড়েননি। এঁরা সত্যিই দুর্ভাগা। এই অর্বাচীনরা যদি তসলিমাকে স্বাগত জানান, দুশ্চিন্তা হয় বইকি! আসলে, এঁরা তসলিমাকেও বোঝেননি। বোঝার কথাও নয়। সেদিন আর দূরে নেই, যেদিন এঁরাই আবার তসলিমার নামে 'গো ব্যাক' ধ্বনি তুলবেন। এটাই ভবিতব্য। তসলিমাকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি এই উদ্বেগটুকুও নথিবদ্ধ থাকুক।

চেনা শহরকে নতুন করে চিনে নিন

বৃষ্টি চৌধুরি

প্রিয় তসলিমা,

বয়সে আপনি অনেকটাই বড়। তবু আপনাকে তসলিমা নামেই সম্বোধন করছি। জানি, বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে এমন সম্বোধন কিছুটা বেমানান। কিন্তু কী নামেই বা সম্বোধন করব। দিদি বলতে যে পরিচিতি লাগে, তা তো নেই। তাছাড়া, আপনি যে সময় শহর ছেড়েছেন, আমি তখনও স্কুলে যাওয়াই শুরু করিনি। আপনার বয়স আমার দ্বিগুনেরও বেশি। বয়সের কথা মাথায় রাখলে বলা যেত, আন্টি। কিন্তু কবির বয়স হয় না। তার থেকে 'তসলিমা' শব্দটাই ভাল। তসলিমা তো শুধু নাম নয়, তসলিমা একটা সাহস, তসলিমা একটা জড়তার প্রাচীর ভাঙা চরিত্র, তসলিমা নামটা একসঙ্গে অনেক কিছুর প্রতীক।

উনিশ বছর পর আপনি কলকাতায় ফিরেছেন। কথাটা লিখতে গিয়েই কেমন যেন বুকের ভিতরটা ভার হয়ে আসে। ফিরে এলাম বলতেই উনিশ বছর লেগে গেল। উনিশ বছর খুব কম সময় নয়। একটা শিশুর জন্ম হয়, বড় হয়ে স্কুলে যায়, কলেজে ওঠে—এই সময়ের মধ্যে। একটা শহরও বদলে যায়। কত বাড়ি ভাঙে, কত নতুন বাড়ি ওঠে, কত রাস্তার চেহারা পাল্টায়। মানুষ আসে, মানুষ চলে যায়। সরকারও বদলে যায়।

কিন্তু কিছু সম্পর্কের বয়স হয় না। কলকাতার সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা বোধহয় তেমনই। আপনি যখন এই শহর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, তখন আপনাকে চেনার বয়সই হয়নি। একটু বড় হয়ে আপনার বই পড়েছি, আপনার লেখা নিয়ে বিতর্ক শুনেছি। আপনাকে নিয়ে এত কথা হয়েছে যে, অনেক সময় মনে হয়েছে—আপনি বুঝি

শুধু একজন লেখক নন, নিজেই একটা বিতর্ক। আপনার সেই বেড়ালকে নিয়ে চূর্ণী গাঙ্গুলির সেই ছবিটাও দেখেছি। চূর্ণীকে অবিকল যেন আপনার মতোই লাগছিল। নির্বাসিতা নারীর যন্ত্রণা কী চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছিলেন!

ধীরে ধীরে বুঝেছি, বিতর্কের আড়ালে আসলে একজন মানুষ আছেন। একজন নারী, যিনি নিজের কথা নিজের মতো করে বলতে চেয়েছেন। আর সেই চাওয়াটাই হয়তো অনেকের কাছে এত অসহ্য হয়ে উঠেছিল। আমি নিজেও একজন নারী। তাই আপনার সঙ্গে আমার একটা অদৃশ্য সম্পর্ক আছে।

আপনার সব কথা আমি সমর্থন করি না। আপনার সব মতের সঙ্গে আমার মিলও নেই। কিন্তু একটা জায়গায় আপনাকে অস্বীকার করতে পারি না—নিজের কথা বলার অধিকারটুকু আপনি কাউকে দিয়ে দেননি। এত বছরের নির্বাসন আপনাকে ভেতরে ভেতরে রক্তাক্ত করেছে। কিন্তু আপনার লেখনি থামিয়ে দিতে পারেনি। তা যেন আরও মার্জিত। আরও সংবেদনশীল।

এই শহরেই তো আপনি লিখেছিলেন, ভালোবেসেছিলেন, বন্ধুত্ব করেছিলেন, ঘুরেছিলেন। এই শহরের বইমেলা, কলেজ স্ট্রিট, গঙ্গার হাওয়া, রাস্তাঘাট—সব কিছুর সঙ্গে আপনার কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তারপর একদিন সেই শহরেই আপনার থাকা অসম্ভব হয়ে গেল। একজন মানুষকে তার নিজের শহর থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া কতটা কষ্টের, তা হয়তো বাইরে থেকে বোঝা যায় না। এই যন্ত্রণা ভেতরে ভেতরে আপনি বয়ে বেড়িয়েছেন।

উনিশ বছর পরে আপনি আবার এসেছেন। জানি না এই ফিরে আসাকে আপনি সত্যিই ‘ঘরে ফেরা’ বলে মনে করছেন কি না। ঘর তো শুধু একটা শহর নয়। ঘর মানে নিরাপত্তা। ঘর মানে নিজের মতো করে নিঃশ্বাস নেওয়ার জায়গা। ঘর মানে ভয় না পাওয়া। তবু কলকাতা আপনাকে দেখে আজ অন্তত এটুকু বলতে চায়—আপনাকে আমরা ভুলিনি। সেদিন রবীন্দ্র সদনে আমি থাকিনি। থাকার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সেখানে এত মানুষের ভিড়, তাঁদের হাতে নিশ্চয় আমন্ত্রণপত্র ছিল। আমাকে কেই বা আমন্ত্রণ পত্র দেবে! কেনই বা দেবে! তার থেকে মনে হয়েছিল, টিভির সামনে বসে আপনাকে দেখাই ভাল।

এই শহরে আপনার জন্য যেমন সমালোচনা আছে, তেমনই ভালোবাসাও আছে। প্রশ্ন আছে, মতবিরোধ আছে, অভিমান আছে। কিন্তু আপনাকে ঘিরে যে কৌতূহল, যে টান, তা এত বছর পরেও ফুরোয়নি। হয়তো এটাই কলকাতার স্বভাব। যাকে একবার নিজের মানুষ ভাবে, তাকে পুরোপুরি ভুলতে পারে না।

তাই ফিরে আসার এই মুহূর্তে আপনাকে কোনও বড় কথা বলতে চাই না। শুধু বলতে চাই, আবার কলকাতার রাস্তায় হাঁটুন। গঙ্গার ধারে বসুন। বইয়ের দোকানে ঢুকুন। কোনও পুরনো বন্ধুর সঙ্গে চা খান। শহরটাকে আবার নিজের চোখে দেখুন। এ কলকাতার মধ্যে আছে আরেকটা কলকাতা—সেটা আপনার থেকে ভাল কে জানে!

স্বাগতম, তসলিমা। এবার একটু ধীরে হাঁটুন। এই শহরটাকে আবার নতুন করে চিনে নিন। আর যদি কখনও মনে হয়, সত্যিই ঘরে ফিরেছেন—তাহলে জানবেন, কলকাতাও হয়তো আপনাকে নিজের মেয়ে বলেই মনে রেখেছিল।

তসলিমা আসলে কাদের বিরুদ্ধে বলে গেলেন!

স্বরূপ গোস্বামী

কিছু কথা কাগজে লেখা থাকে। অনেকেই সেটা পড়তে পারেন। বুঝতেও পারেন।

অনেক কিছুই আছে, যা কাগজে লেখা থাকে না। অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে সেটা পড়াও যায় না। বোঝাও যায় না।

অনেকটা ক্রিকেটের সেই স্কোরবোর্ডের মতো। মনে হয়, অনেক কিছুই লেখা থাকে। আসলে, অনেক কিছুই লেখা নেই।

তসলিমা নাসরিন ঠিক কী বলবেন, গত কয়েকদিন ধরে কৌতূহলের অন্ত ছিল না। যে যাঁর মতো করে ভেবে নিয়েছিলেন। দুদিন আগে দিল্লি থেকেই বিভিন্ন কাগজকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। কলকাতায় নেমেও অনেক চ্যানেলের বুমের সামনে টুকটাক দু'চার কথা বলেছেন। প্রশ্নের বাউন্সার ছিল। কোথাও এড়িয়ে গেছেন, কোথাও সটান হুক করেছেন। বক্তৃতার অভিমুখ কী হতে চলেছে, একটা আভাস ছিল।

তবু রবীন্দ্র সদনের সভায় কী বলেন, তা নিয়ে আগ্রহ তো ছিলই। মোটামুটি প্রত্যাশিতই ছিল, তিনি রাজ্যের নতুন সরকারের প্রশংসা করবেন। বাম সরকারের দিকে কিছু কটাক্ষ ছুড়ে দেবেন। লিখে আনা দীর্ঘ বক্তৃতায় আপাতভাবে মনে হবে, সেটাই হয়েছে।

কিন্তু একটু খুঁটিয়ে যদি তাঁর ভাষণ শোনা যায়, একবারের বদলে দু'বার বা তিনবার শোনা যায়, তাহলে পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মতো কিছু কথার মানে পরিষ্কার হবে। বিটুইন দ্য লাইন্স–এ একটু ডুব দিতে পারলে বোঝা যাবে, বামেদের বিরুদ্ধে যা বলেছেন, তা নেহাতই সামান্য। বড়জোর দশ শতাংশ। কিন্তু আসলে যাঁদের বিরুদ্ধে বলে গেলেন, তাঁদের মাথায় হয়তো সেটা ঢুকলই না।

শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী বলে গেলেন, 'আপনি যতবার খুশি আসুন, আপনাকে নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীর।' বদলে যাওয়া বাংলার কথা শোনালেন। মুখ্যমন্ত্রী যদি কোনও সাহিত্যিককে এমন আশ্বাস দেন, সেটা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। একজন মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে এটাই তো প্রত্যাশিত।

কিন্তু তাঁর কিছু ব্যস্ততা ছিল। ফলে, তসলিমার লিখে আনা ভাষণ না শুনেই চলে যেতে হয়। ভাগ্যিস শোনেননি। যদি শুনতেন, তাহলে এমন দরাজ গলায় হয়তো বলতে পারতেন না, 'যতবার খুশি আসুন'। পুরো ভাষণ শুনলে হয়তো খোঁজ নিতেন, কারা এনেছেন। কেন এনেছেন।

আসলে, দুই পক্ষের একটা জায়গায় প্রচণ্ড মিল। যে মৌলবাদি শক্তি তসলিমাকে বাংলা ছাড়ার ফতোয়া দিযেছিল, তাঁরা প্রায় কেউই তসলিমার লেখা পড়েননি। আবার রবীন্দ্র সদন যে গেরুয়া বাহিনীর হাততালিতে উপচে পড়ল, তাঁদের অধিকাংশেরও একই দশা। তাঁদের কতজন ফেসবুকের বাইরে ছাপার অক্ষরে তসলিমার লেখা পড়েছেন, ঘোর সন্দেহ।

মূলস্রোত মিডিয়ার শিরোনাম কী হবে, জানা কথা। এক জায়গায় তসলিমা বলেছেন, 'ইতিহাস মনে রাখে কারা দরজা বন্ধ করেছিল। ইতিহাস মনে রাখবে কারা দরজা খুলেছিল।' বেশ জবরদস্ত একটা লাইন। অনেকক্ষণ ধরে হাততালি চলল। অনেকে তো এমন চোখা লোখা লাইনই চাইছিলেন। অনেকটা সময় ব্যয় করলেন নিজের দেশের মৌলবাদিদের কার্যকলাপ নিয়ে। এতেও হাততালি পড়ারই কথা। কারণ, বাংলাদেশ অত্যন্ত খারাপ একটা দেশ, বাংলাদেশ মানেই জঙ্গি— গত দু'তিন বছর ধরে এমন একটা প্রচার বাজারে দারুণ খেয়েছে।

কিন্তু বেশিরভাগ সময় এমন উদ্বেগ উঠে এল, যাতে বেলুন চুপসে যাওয়ারই কথা। রাষ্ট্র যখন নিজের কর্তব্য ভুলে ধর্মীয় উন্মাদনায় সামিল হয়ে যায়, তখন তা বড় এক সঙ্কট ডেকে আনে। এই কথাটাই বারবার উঠে এল। এটা শুনলে অনেকের ভাল লাগার কথা নয়। 'সরকার যখন ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেয়, তখন রাষ্ট্র আর রাষ্ট্র থাকে না। সে তার কর্তব্য ভুলে

যায়।’ হাততালি দেওয়া হাতগুলো নিশ্চয় এমন সম্প্রীতির বাণী আশা করেননি।

অনেকেই অভিন্ন দেওয়ানি নিয়ে লাফালাফি করছেন। যেন সেটা হলেই সবকিছু সুজলাং সুফলাং হয়ে যাবে। তসলিমাও অভিন্ন দেওয়ানির পক্ষেই সওয়াল করেছেন। তবে একটু অন্যভাবে। ‘ভারত, বাংলাদেশ— দু’দেশেই ধর্মীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি দরকার। তবে তা সংখ্যাগুরুর ধর্মের বিধান নয়। সংবিধান, মানবাধিকার এবং সমানাধিকার ভিত্তিতে তৈরি হওয়া নাগরিক আইন।’ কথাটার মানে বোঝা গেল?

বাংলাদেশে মুক্তকণ্ঠকে কীভাবে বারবার অবরুদ্ধ করা হয়েছে, সেই কথা তুলে আনলেন। বিরুদ্ধ মত বা পাল্টা যুক্তি মানেই শত্রুতা নয়। কেউই সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়।— এমনটাও বারবার বলে গেলেন। আচ্ছা, আমাদের দেশের আঙ্গিকে যদি ভাবা যায়, এটা কার বিরুদ্ধে খাটে! একটু ভিন্নমত বা একটু সমালোচনা হলেই কারা যেন কথায় কথায় ‘দেশদ্রোহী’ তকমা এঁটে দেয়! তসলিমা যেন তাঁদেরই আয়না দেখিয়ে গেলেন।

উনিশ বছর পর তিনি বাংলায়। আবেগ ছিল। চাপা কান্না ছিল। নির্বাসিত থাকার যন্ত্রণা ছিল। উদ্বেগ ছিল। কলকাতা তাঁর সেই পবিত্র অনুভূতির শরিক হয়েছে। মুক্তচিন্তার মানুষেরা মুক্তকণ্ঠে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছেন। কিন্তু যেটা বলে গেলেন, ঠিকঠাক মানে বুঝলে সরকারপক্ষের খুব একটা উল্লসিত হওয়ার কথা নয়। কিন্তু তাঁরা যে মর্মার্থ বুঝবেন, তাঁদের চেতনার ওপর এতখানি আস্থা রাখা কঠিন।

বাম বন্ধুদের নিয়েও দুশ্চিন্তা কম নেই। তাঁরাও ভাল করে গোটাটা না শুনে দু-একটা ছোট ছোট রিলস দেখে হয়তো ফেসবুকে লিখে বসবেন, ‘তসলিমা বিজেপির দালাল।’ এটুকু লিখে নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলবেন, ‘কেমন দিলাম!’ গোটা ভাষণ মন দিয়ে শুনে, বিটুইন দ্য লাইন্স টুকু বোঝার মতো ধৈর্য বা সংযম এই শিবিরেও দিন দিন কমে আসছে।

দু’পক্ষই ভাবুন। ভাবুন। একটু ভাবা প্র্যাকটিস করুন।

জয় গোস্বামীর হেনস্থা দেখে এত বিকৃত উল্লাস?

রক্তিম মিত্র

রবীন্দ্র সদনে সেদিন যাঁর ভিড় করেছিলেন, তাঁরা আসলে কারা? কেউ কেউ সত্যিই তসলিমা নাসরিনের অনুরাগী। কেউ কেউ মুক্তচিন্তার সমর্থক। কেউ কেউ সত্যিই সেদিন তসলিমাকে স্বাগত জানাতে গিয়েছিলেন। কিন্তু জয় গোস্বামীর নাম শুনে যারা রে রে করে তেড়ে উঠলেন, তাঁরা আসলে কারা?

বলার চেষ্টা হচ্ছে, তাঁরা নাকি রাষ্ট্রবাদী। তাঁরা নাকি প্রতিবাদী। সত্যি, রাষ্ট্রবাদী, প্রতিবাদী এই শব্দগুলোর কি চমৎকার অপব্যবহার। যার তার নামের পাশে কী অবলীলায় এই শব্দ দুটো জুড়ে দেওয়া যাচ্ছে। একটা নির্লজ্জ অসভ্যতাকে আড়াল করতে কত মিথ্যে বাহানা দিতে হচ্ছে। ঘুরিয়ে পেচিয়ে না বলাই ভালো। এদের সঙ্গে সাহিত্যের ন্যূনতম সম্পর্ক নেই। এরা না তসলিমার অনুরাগী, না মুক্তচিন্তার সমর্থক। বাংলাদেশ থেকে যাঁরা তসলিমাকে বিতাড়ন করেছেন, তাঁদের সঙ্গে এই অর্বাচীনদের কোনও ফারাক নেই।

অবশ্য জয় গোস্বামীর কবিতা পড়তে এবং বুঝতে যে শিক্ষা ও মনন প্রয়োজন, তার

থেকে এরা আলোকবর্ষ দূরে। এরা কবিকে হেনস্থা করেই আনন্দ পান। এরা শুধু রবীন্দ্র সদনে ছিলেন এমন ভাবার কারণ নেই। জেলায় জেলায়, নানা রাজ্যে এরা ছড়িয়ে আছেন। যারা মোবাইলে বাংলার অগ্রগণ্য কবির হেনস্থা দেখে এক বিকৃত আনন্দে গা ভাসাচ্ছেন।

জয় গোস্বামীর অপরাধটা কোথায়? কয়েক বছর ধরেই জয় গোস্বামী খুব সফট টার্গেট। কবির নামে যা খুশি বলা যায়। কবি পাল্টা মার দিতে আসবেন না। কবি ঘরে আগুন ধরাতে আসবেন না। কবি কারও দিকে ঢিল ছুড়বেন না। এমনকি এই নিরীহ কবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পাল্টা বাক্যবানও নিক্ষেপ করবেন না। সব অপমান নীরবে হজম করবেন।

তাঁকে সরকারি কয়েকটা অনুষ্ঠানে দেখা গেছে। এক দুটি কমিটিতেও ছিলেন। হাতে গোনা কয়েকটা প্রতিবাদ সভায় হয়তো উপস্থিত থাকতে হয়েছে। জোর করে হাতে মাইক ধরিয়ে দিলে দু চার কথা বলতেও হয়েছে। ব্যাস, এটাই তার অপরাধ। কেউ আখ্যা দিচ্ছেন তৃণমূলের চটি চাটা। কেউ বলে বসেছেন মমতার দালাল। কেউ বলেছেন ক্ষমতার উচ্ছিষ্টভোগী। যার মুখে যা এসেছে, সেটাই বলেছেন। কবি কোনও পাল্টা প্রত্যুত্তর করেননি। এই ভদ্রতার সুযোগ নিয়েছেন একদল মানুষ। এদের কেউ কেউ জয় শ্রীরাম বলেন, কেউ কেউ মোদির নামে জয়ধ্বনি তোলেন। আবার কেউ কেউ ইনক্লাব জিন্দাবাদও বলেন।

তিনি নাকি তৃণমূলের সমর্থক। তর্কের খাতিরে না হয় ধরেই নিলাম। কিন্তু তৃণমূলের কোন দুর্নীতির সঙ্গে এই মানুষটি যুক্ত? তিনি তৃণমূলের টিকেটে এমপি বা এম এল এ হয়েছেন? তৃণমূলের টিকিট পাওয়ার জন্য কখনও তাকে লালায়িত মনে হয়েছে? তিনি অন্য দলের বিধায়ক বা পঞ্চায়েত সদস্যদের দল ভাঙিয়ে তৃণমূল এনেছেন?

তিনি বিভিন্ন জেলা থেকে টাকা তুলে মেধা তালিকাকে ডাস্টবিনে ফেলে অযোগ্য লোককে চাকরি দিয়েছেন? বিরোধীদের হুংকার দিয়েছেন? মিথ্যে মামলায় জেল খাটিয়েছেন? কখনও বিরোধী দলের কারও নামে কদর্য আক্রমণ করেছেন? এসবের কোনওটাই তো করেননি। তাহলে তাঁর নামে এত ঘৃণা, এত বিদ্বেষ কেন?

কোনও কোনও ইস্যুতে হয়তো তৃণমূলের সমর্থনে মৃদু স্বরে কথা বলেছেন। তার জন্য তাঁকে এত গালাগাল শুনতে হয়। তাহলে তো শুভেন্দু অধিকারী কেও একই কারণে এর ১০০০ গুন বেশি ধিক্কার দেওয়া উচিত। তিনি তো আরও চড়া সুরে তৃণমূলের দালালি করেছেন। প্রতিটি অপকর্মে শুধু শামিল ছিলেন তাই নয়, কার্যত নেতৃত্ব দিয়েছে। এত বছর এমপি, এমএলএ, মন্ত্রী থেকেছেন। অন্যের দল ভাঙ্গিয়েছেন। মিথ্যে মামলায় বিরোধীদের জেল খাটিয়েছেন। জেলায় জেলায় প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে হুংকার দিয়েছেন। বিভিন্ন জেলা থেকে নানা অনিয়মেও তার নাম জড়িয়েছিল। নিজের হাতে ঘুষ নেওয়ার দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি। ঘটনাচক্রে আজ তিনি অন্য শিবিরে। তাতে অতীতের অপরাধ মাফ হয়ে যায় না। তাঁর বক্তৃতায় হাততালি দেবেন, তাঁর নামে জয়ধ্বনি দেবেন, আর জয় গোস্বামীকে দেখলে রে রে করে তেড়ে উঠবেন, এ কেমন যুক্তি?

তসলিমার আগে বিজেপির যে দুই মাতব্বর ধর্মীয় উস্কানি ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে গেলেন, তাঁদের নামে ধিক্কার দেওয়ার কথা এই দর্শকদের মনে পড়েনি। তাঁরা বেছে নিলেন এমন এক কবিকে যিনি সম্প্রীতির কথা বলেন। যিনি ধর্মীয় উস্কানি থেকে দূরে থাকেন। জয় গোস্বামী প্রতিবাদ করেননি? তাঁর লেখা কতটুকু পড়েছেন? তাঁর একটি উপন্যাস, একটি প্রবন্ধ কোনও দিন পড়ার প্রয়োজন মনে করেছেন? অবশ্য এগুলো পড়তে গেলে যে শিক্ষার রুচি ও মনোন য় প্রয়োজন, তা এই অর্বাচীনদের নেই।

ধন্যবাদ তাসলিমা। এই উন্মত্ত জনতার কদর্য চিৎকারে তিনি অন্তত শামিল হননি। বিষয়টা যে অপমানজনক, স্পষ্ট ভাষায় তিনি সেটা বলেছেন। তসলিমা সত্যিই সাহসী। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা অনেকটাই বেড়ে গেল। আর যাঁরা তাঁকে বরণ করে নেওয়ার নাটক করলেন, তাঁরা কখনই সাহিত্যের বা মুক্ত চিন্তার সমর্থক হতে পারেন না।, তা আরও একবার বুঝিয়ে দিলেন। বাংলাদেশের সেই ফতোয়া দেওয়া লোকেরা যদি মৌলবাদী হয়ে থাকেন, তবে জয় গোস্বামীকে অপমান করা এই অর্বাচীনরাও কোনও অংশে কম মৌলবাদী নন।

নির্বাসিত নারী

স্নেহাশিস মুখার্জি

একদিন কলকাতায় এসেছিল এক নির্বাসিত নারী,
বুকের ভিতর তখনও জ্বলছিল নিজের ভাষার আগুন।
শহর তাকে চিনেছিল—কেউ ভালোবেসে, কেউ ভয় পেয়ে,
কেউ বা নিঃশব্দে তুলে দিয়েছিল কাঁটাতারের দিকনির্দেশ।

তারপর দীর্ঘ পথ—দেশ থেকে দেশ, দরজা থেকে দরজা,
পাসপোর্টে বদলেছে ঠিকানা, বদলায়নি ক্ষত।
যে শহরকে একদিন আপন ভেবেছিল,
সেই শহরের স্মৃতিই হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে দীর্ঘ নির্বাসন।

সে শুধু নিজের জন্য লেখেনি—
একটি মেয়ের চোখে যে আকাশ আটকে রাখা হয়, তার জন্য লিখেছে।
যে নারী প্রশ্ন করলে পাপী হয়ে যায়,
তার ঠোঁটে তুলে দিয়েছে প্রশ্নেরই ভাষা।

মুক্তচিন্তা তো কোনও রাজদরবারের অনুমতি নয়,
সে একলা মানুষের বুকের ভিতর জন্ম নেওয়া বাতাস।
তাই তাকে যতবার নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে,
ততবার তার শব্দ ফিরে এসেছে মানুষের ঘরে।

কলকাতা, তুমি কি আজও তাকে ডাকো?
নাকি নির্বাসনেই সে খুঁজে পেয়েছে তার সবচেয়ে বড় দেশ—
যেখানে নারী মানুষ, প্রশ্ন অপরাধ নয়,
আর স্বাধীনতা মানে—নিজের মতো করে বেঁচে থাকা।

জাতীয় পুরস্কার না পেলেই বরং অবিচার হবে

বৃষ্টি চৌধুরি

কোনও ছবির সিকুয়েল হলে, সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জার হয়ে দাঁড়ায় আগের ছবি। কোনও ছবি হিট বা সফল হলে, তখন তার সিকুয়েল বানানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। অর্থাৎ, আগের ছবির চরিত্রগুলো এক রেখে, আগের কাহিনির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, নতুন গল্প। বা বলা যায়, আগের গল্পটাকে আরও একটু এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

প্রায়শই দেখা যায়, প্রথম ছবি যতটা দাগ কেটেছিল, দ্বিতীয় ছবি ততটা ছাপ ফেলল না। হিন্দি, বাংলা সব ভাষাতেই এর ভুরি ভুরি উদাহরণ পাওয়া যাবে। একেবারে সাম্প্রতিক কালের ছবির কথাই যদি ধরা যায়, বেলাশেষে যে উচ্চতায় পৌঁছেছিল, বেলাশুরু তেমন ছাপ ফেলতে পারেনি। সেই শিবপ্রসাদ–নন্দিতা জুটিরই হামি যতটা সাড়া ফেলেছিল, ‘হামি ২’

তেমন মনে ধরেনি। যদি কৌশিক গাঙ্গুলির কথাই ধরা যায়, বিসর্জন যতখানি মানবিক আবেদন নিয়ে হাজির হয়েছিল, বিজয়া সেই উচ্চতায় পৌঁছোতে পারেনি।

তাই কৌশিক যখন অর্ধাঙ্গিনীর দ্বিতীয় পার্ট বানাতে চাইলেন, একটা সংশয় ছিল, পারবেন তো! আগের অর্ধাঙ্গিনীর কাছাকাছি পৌঁছোনো যাবে তো! স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, এই অর্ধাঙ্গিনী (আজও অর্ধাঙ্গিনী) আগের ছবিকেও ছাপিয়ে গেছে। কী চিত্রনাট্যে, কী অভিনয়ে, কী চরিত্র নির্বাচনে, কী সংলাপে। এবারের সংলাপ অনেক বেশি বুদ্ধিদীপ্ত। অনেক বেশি ম্যাচিওরিটির ছাপ। তারই মাঝে উঁকি দিচ্ছে সূক্ষ্ম রসবোধ। চরিত্র নির্মাণে এবার অনেক বেশি যত্নশীল কৌশিক। সাদা আর কালোর মাঝে একটা লম্বা আলপথ আছে। কাউকেই এককথায় ‘সাদা’ বলে চিহ্নিত করা যাবে না। আবার কোনও চরিত্রকেই ‘কালো’ বলে বাতিলও করা যাবে না। ভাল–মন্দের নানা দ্বিধা–দ্বন্দ্ব পথ চলেছে হাত ধরাধরি করে।

মধ্যবিত্ত জীবনের টুকরো টুকরো নানা জট সুন্দরভাবে ধরা দিয়েছে। কেউ একটু দৃঢ়চেতা, কেউ আবার তুলনায় নরম। একই চরিত্রে নানা অভিঘাত। কখনও যেন

তাড়া করছে দ্বিধা। পথের নানা বাঁকে এসে নানা চিন্তার স্রোত। কোনটা আসলে সঠিক পথ। উঠে এসেছে নানা প্রশ্নের ঝাঁক। যে যাঁর নিজের মতো করে সমাধানের রাস্তা খুঁজছেন। চিন্তায়, তর্কে উঠে আসছে নানা বিকল্প স্রোত। যা দর্শককে ভাবায়, কখনও ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

তবে সবথেকে বেশি করে যিনি দাগ কেটে যান, তিনি অবশ্যই চূর্ণী গাঙ্গুলি। কেন মূলস্রোত ছবি এমন অভিনেত্রীকে ঠিকঠাক ব্যবহার করতে পারেনি, জোরালো প্রশ্ন যেন তুলে দিয়ে গেলেন স্বয়ং চূর্ণী। এমন একটা চরিত্র, যার মধ্যে ছত্রে ছত্রে চ্যালেঞ্জ। প্রতিটি দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিপুণ অভিনয়ে

সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন চূর্ণী। নিজের ঘরণিকে এমন চরিত্রে কাস্ট করে কোনও অন্যায় করেননি পরিচালক। এমন মেধা ও মননের বিচ্ছুরণ টলিউডে আর কজনের মধ্যে পাওয়া যেত! এই ছবি জাতীয় পুরস্কার পেলে তা মোটেই অন্যায় হবে না। অভিনয়ের জন্য চূর্ণী বা চিত্রনাট্যের জন্য কৌশিকও পুরস্কার পেতেই পারেন। এই ছবি কোনও পুরস্কার না পেলে সেটাই বরং অবিচার হবে।

আরেক কৌশিক, কৌশিক সেন। তিনি যে কত বড় মাপের অভনেতা, আরও একবার তার ছাপ রাখলেন। ট্রোলের নেশায় মত্ত বাঙালি কৌশিকের প্রতি কখনই সুবিচার করেনি। আর দশজন রাজনীতির কারবারির সঙ্গে তাঁকেও কেমন গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। আপাতভাবে চরিত্রটি কালো রাংতায় মোড়া। কোথাও স্ববিরোধ, কোথাও মধ্যবিত্ত দ্বিচারিতা। কিন্তু বেলাশেষের আয়নায় যেন এই চরিত্রটাই হয়ে ওঠে আরও ঝকঝকে, আরও সাবলীল। এক চরিত্র থেকে নিজেকে ভেঙে এই নবনির্মাণের চ্যালেঞ্জটাও খুব সহজ ছিল না। উতরে গেছেন বললে কম বলা হয়। অম্বরীশ ভট্টাচার্য। বেশ নরম–সরম গোলগাল চেহারা। অদ্ভুত এক ভাল লাগার চাদর যেন গায়ে জড়িয়ে আছেন। পরম মমতায় এই চরিত্রও নির্মাণ করেছেন কৌশিক। অম্বরীশকে বাড়তি কোনও পরিশ্রম করতে হয়নি। তাঁর আচরণ ও শরীরী ভাষার সঙ্গে যেটা মানানসই, সেটাই করে গেছেন। এই না–অভিনয়টাও তো বড় একটা চ্যালেঞ্জ। ওই যে কবি লিখেছিলেন, সহজ কথা যায় না বলা সহজে।

ছবি শুরুই হল ইমনের কণ্ঠে অনুপমের সেই গান দিয়ে। ‘আমি আবার ক্লান্ত পথচারী, এই কাঁটার মুকুট লাগে ভারী। ছুঁতে গিয়েও যেন হাতের নাগালে না পাই।’ আগের ছবির সেই রেশ এই ছবিতে যেন ধরা দিল এই গানের হাত ধরেই। প্রথম থেকে দ্বিতীয় ছবিতে পা বাড়াতে গেলে, তুলনা অনিবার্য। কারণ, আগের ছবি একটা প্রত্যাশার জন্ম দেয়। পরের ছবিতে প্রথমে সেই প্রত্যাশার মর্যাদা রাখতে হয়। তারপর, সম্ভব হলে সেই প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে যেতে হয়। সেই কাজে পুরোপুরি সফল পুরো অর্ধাঙ্গিনী টিম। মেয়েরা নাকি অর্ধেক আকাশ। কিন্তু দুই অর্ধাঙ্গিনী একত্রে যেন ধরা দিলেন ‘পূর্ণাঙ্গিনী’ হয়ে। আর অর্ধেক নয়, আস্ত একটা আকাশ, যে আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরে, যে আকাশে রামধনু খেলা করে।

যাক, কিছুটা হলেও প্রাসঙ্গিক হল বিধানসভা

অজয় কুমার

খুব ছোটবেলা থেকেই একটি কথা শুনে আসছি। মানুষের সমস্যার কথা বিধানসভায় তুলে ধরব। যিনিই ভোটে দাঁড়াতেন, তিনিই এমন একটা আশ্বাস দিতেন।

আবার বিধায়ক বিধানসভায় ভাষণ দিয়েই এলাকায় ফিরে দাবি করতেন, আপনাদের সমস্যার কথা বিধানসভায় জানিয়েছি।

প্রশ্ন হল, বিধানসভায় এসব বলে কতখানি লাভ হত? সমস্যা কি আদৌ মিটত? নাকি সমস্যা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই থেকে যেত?

বিধানসভার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল উল্লেখ পর্ব। বা মেনশন আওয়ার।

প্রশ্নোত্তর পর্বের পর এক থেকে দেড় ঘণ্টা এই পর্ব চলে। বিধায়করা নিজের নিজের এলাকার কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরেন। মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নিয়ম অনুযায়ী, বিধানসভার সচিবালয়ের পক্ষ থেকে সেই দাবি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা। মন্ত্রী তাঁর দপ্তরের সচিবকে বা অন্যান্য অফিসারদের বলবেন বিষয়টি খোঁজ নিতে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে।

কিন্তু সব তো নিয়মমাফিক হয় না। তাই একটা সময় শিথিলতা আসে। বিধায়ক যথারীতি বলতেন। মন্ত্রী যথারীতি সভায় অনুপস্থিত থাকতেন। বিধায়কের দাবি মন্ত্রীর দপ্তর পর্যন্ত পৌঁছোতো না। আগে তবু এইসব দাবিদাওয়ারকথা কাগজে বেরোতো। ইদানীং কাগজ থেকে এই বিষয়টা কার্যত ব্রাত্য হয়ে গেছে। কে কী দাবি তুলছেন, জানাও যায় না।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সম্প্রতি বিধানসভায় উল্লেখ পর্বকে আরও গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন। সচিবালয় যেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর কাছে বিধায়কের দাবি পাঠিয়ে দেন, সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিভাগীয় মন্ত্রীকে বলা হয়েছে, দ্রুত বিষয়টি দেখতে এবং অগ্রগতির কথা সেই বিধায়ককে চিঠি লিখে জানাতে। বিধায়কের দাবির একটি প্রতিলিপি তাঁর অধীনস্থ সিএমও–তেও পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ, সেই দাবির কতটা কার্যকর হল, মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ও তদারকি করবে।

নিঃসন্দেহে সাধু উদ্যোগ। এতে বিধায়কদের যেমন উৎসাহ বাড়বে, তেমনই তাঁদের তোলা বিভিন্ন দাবি উপযুক্ত গুরুত্ব পাবে, আশা করাই যায়। সাম্প্রতিক নানা ঘটনায় বিধানসভার ছবি খুব একটা উজ্জল হয়নি। এমনকী অনেকক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় দাঁড়িয়ে এমন কিছউ মন্তব্য করেছেন বা হুঙ্কার দিয়েছেন, যা বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলাটা শোভনীয় নয়। কিন্তু এই পদক্ষেপ বিধানসভার মর্যাদা কিছুটা হলেও ফিরিয়ে আনবে। বিধানসভা যেন হল্লাবাজির আখড়া না হয়ে ওঠে, সেটা দেখা সকলের কর্তব্য। এক্ষেত্রে শাসকের দায় ও দায়িত্ব সবসময়ই বেশি। নানা কারণে উল্লেখ পর্ব তার গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা হারাচ্ছিল। অবশেষে উল্লেখ পর্বের গুরুত্ব ফিরিয়ে আনার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তাকে স্বাগত।

সহজ কাজটাই এতদিন বেশ কঠিন ছিল

সৃজন শীল

সুমনের গানের লাইন, প্রশ্নগুলো সহজ, আর উত্তরও তো জানা। কিন্তু কখনও এমন পরিস্থিতি আসে, যেখানে প্রশ্নগুলো সহজ হলেও অনুচ্চারিতই থেকে যায়। কারণ, প্রশ্ন করলেই জুটে যেত দেশদ্রোহীর তকমা। বুঝিয়ে দেওয়া হত, শাসকের উত্তর দেওয়ার কোনও দায় নেই। বরং সে পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দেয়। পাল্টা তকমা লাগিয়ে দেয়।

বারো বছরের একটা সরকার। অথচ, কোনও ব্যর্থতার দায় নেওয়া এঁদের অভিধানে নেই। এখনও যেন জবাব দেওয়ার দায় জওহরলাল নেহরুর। তেমনই হয়েছিল মূলস্রোত মিডিয়া। তাঁরাও দেশের জনগণকেই যেন শত্রু বানিয়ে বসেছিল। প্রশ্ন করলেই বলা হত, পাকিস্তানে চলে যাও। বোঝানো হত, যাবতীয় ব্যর্থতার দায় সরকারের নয়, বিরোধীদের। আর বিরোধীরাও নানা সমীকরণে ছত্রভঙ্গ। ফলে, গত বারো বছরে তেমন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তেই হয়নি মোদি সরকারকে।

একটা সময় ছিল, কোনও মন্ত্রীকে সরাতে হলে দরকার হত বড় রাজনৈতিক দল, বড় মিছিল, বড় নেতা। এখন সেই ছবিটা বদলাচ্ছে। দিল্লির যন্তর মন্তরে কয়েক সপ্তাহ ধরে বসে থাকা একদল তরুণ দেখিয়ে দিল, বড় নেতা ছাড়াও আন্দোলন হতে পারে। দলীয় পতাকা ছাড়াও প্রশ্ন তোলা যায়। আর সরকারকেও শেষ পর্যন্ত সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়।

নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ও অনিয়মের অভিযোগকে কেন্দ্র করে জেন জি-র নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল এই আন্দোলন। সামনে ছিল ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ বা সিজেপি। নামটি যতটা ব্যতিক্রমী, আন্দোলনের ধরনও

ততটাই আলাদা। প্রচলিত রাজনীতির ভাষা নয়, সোশ্যাল মিডিয়া, মিম, ইনস্টাগ্রাম পোস্ট, সরাসরি যোগাযোগ—এসবকেই তাঁরা আন্দোলনের হাতিয়ার করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ৩৬ দিনের আন্দোলনের পর কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করেন। সরকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ক্ষতিপূরণ এবং আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলা প্রত্যাহারের মতো দাবিও মেনে নেয়।

এখানেই এই আন্দোলনের সবচেয়ে বড় ইতিবাচক দিক। তরুণরা দেখিয়ে দিল, প্রশ্ন করা এখনও সম্ভব। রাজনীতির প্রতি অনাস্থা থাকলেও রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকলে পরিবর্তন আসে না। এত দিন অনেক তরুণের সম্পর্কে ধারণা ছিল—তাঁরা ভোট দেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় মতামত দেন, কিন্তু রাস্তায় নামেন না। জেন জি-র এই আন্দোলন সেই ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছে। তারা বলেছে, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস শুধু কয়েকজন ছাত্রের সমস্যা নয়; এটা মেধা, পরিশ্রম এবং ভবিষ্যতের সঙ্গে প্রতারণা।

আরও গুরুত্বপূর্ণ, আন্দোলনটি কোনও প্রচলিত রাজনৈতিক দলের ছাতার নীচে দাঁড়ায়নি। সেটাই তার শক্তি। কোনও দল ক্ষমতায় গেলে কী হবে, কে প্রধানমন্ত্রী হবেন—এসবের বদলে আন্দোলনের মূল প্রশ্ন ছিল, ব্যবস্থা ঠিকঠাক চলছে কি

পরিচালনায় স্বচ্ছতা আসবে কী ভাবে, তদন্ত হবে কতটা নিরপেক্ষ ভাবে—এসব প্রশ্নের উত্তর এখনও প্রয়োজন। সুতরাং জেন জি-র আসল পরীক্ষা এখন শুরু।

তাঁরা যদি শুধু একজন মন্ত্রীর পদত্যাগে থেমে যায়, তা হলে এটি একটি সফল আন্দোলন হয়েই থাকবে। কিন্তু যদি এই আন্দোলন আরও স্বচ্ছ পরীক্ষা, জবাবদিহিমূলক প্রশাসন এবং তরুণদের ভবিষ্যৎ নিয়ে বৃহত্তর সামাজিক দাবিতে পরিণত হয়, তা হলে এর গুরুত্ব অনেক বেশি। এই প্রজন্ম রাজনীতিকে হয়তো নতুন কোনও দল দিতে চায় না। বরং রাজনীতিকে একটা পুরনো কথাই নতুন করে মনে করিয়ে দিতে চায়—ক্ষমতায় থাকলেই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার অধিকার পাওয়া যায় না। আর নাগরিক তরুণ হলে তো নয়ই। জেন জি-র সবচেয়ে বড় শিক্ষা সম্ভবত এটাই—চুপ করে থাকা কোনও বাধ্যবাধকতা নয়। প্রশ্ন করতে হয়। দাবি জানাতে হয়। আর প্রয়োজন হলে ক্ষমতার দরজায় গিয়ে কড়া নাড়তেও হয়। কারণ, গণতন্ত্রে শেষ কথা সরকারের নয়। শেষ কথা নাগরিকের।

না। এই জায়গাটি ভারতীয় গণতন্ত্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, গণতন্ত্র শুধু পাঁচ বছর অন্তর ভোট দেওয়ার নাম নয়। সরকারের কাজ নিয়ে প্রশ্ন করা, অন্যায়ের প্রতিবাদ করা, জবাবদিহি দাবি করাও গণতন্ত্রের অংশ।

জেন জি আরও একটি শিক্ষা দিয়েছে—আজকের আন্দোলনের ভাষা বদলে গেছে। মিছিল আছে, পোস্টার আছে, কিন্তু তার সঙ্গে আছে ইনস্টাগ্রাম, মিম, ভিডিও এবং ডিজিটাল যোগাযোগ। যে প্রজন্মকে অনেকে শুধু মোবাইল-নির্ভর বলে ঠাট্টা করেন, তারাই সেই মোবাইলকে প্রতিবাদের শক্তিশালী মাধ্যম বানিয়ে ফেলেছে। তবে এই জয়কে শুধু একজন মন্ত্রীর পদত্যাগে সীমাবদ্ধ রাখলে ভুল হবে। একজন মন্ত্রী চলে গেলেই পরীক্ষাব্যবস্থার সব সমস্যা মিটে যায় না। প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ হবে কী ভাবে, পরীক্ষা

চুপি চুপি বরং ক্ষমা চেয়ে নিন

রক্তিম মিত্র

তিনি সবাইকে ক্ষমা করে দিলেন। ঘটা করে সেই ক্ষমা করার কথা প্রচারও করেছেন। সত্যিই তিনি মহৎ। ছাত্রদের কটূক্তিকে তিনি ক্ষমা করে দিলেন।

কিন্তু তিনি মহৎ হলে হবে কী! তাঁর ভক্তের দল থানায় থানায় এফআইআর করে চলেছে। আর পুলিশও সেইসব এফআইআর নিয়ে চলেছে। চ্যানেলে, কাগজে সেইসব খবর ফলাও করে প্রচারও হচ্ছে।

মোদ্দা কথা, প্রধানমন্ত্রীর কোনও সমালোচনা করা যাবে না। তাঁর সমালোচনা করলেই, তাঁকে নিয়ে নিরীহ কার্টুন আঁকলেই তা দেশদ্রোহিতার সামিল।

যাঁরা এফআইআর করছেন, তাঁরা কারা? একটু খোঁজ নিলে দেখা যাবে, তাঁরা নিজেরাই কয়েকমাস আগে তৃণমূল ছিলেন। তখন একদিকে নেত্রীর গুণকীর্তন করতেন, অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর নামে গাল পাড়তেন। তাঁরাই ভোল বদল করে রাতারাতি দেশভক্ত। তাঁদের দেশভক্তির চোটে জনতার প্রাণ ওষ্ঠাগত।

প্রধানমন্ত্রীও কম যান না। তিনি আন্দোলনকারী ছাত্রসমাজকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আহা! কী উদারতা! এমনিতেই প্রধানমন্ত্রী একজন ব্যস্ত

মানুষ। তবু মাঝে মাঝে যদি অবসর মেলে, তাহলে নিজের কিছু পুরনো ভাষণ শুনুন। জনসভা হলে তো কথাই নেই। এমনকী বিদেশের মাটিতে দেওয়া ভাষণ বা পার্লামেন্টে দেওয়া ভাষণেও ছত্রে ছত্রে মহানুভবতা ছড়িয়ে।

বিদেশে তাঁর দেওয়া ভাষণের নির্যাস কী? মোদ্দা কথা, আমার দেশে আগে যাঁরা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তাঁদের সবাই অযোগ্য। একমাত্র আমি দায়িত্ব নেওয়ার পরই দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। পার্লামেটে দেওয়া ভাষণের নির্যাস কী? সব প্রধানমন্ত্রীরা অপদার্থ। বিরোধীরা সবাই দুর্নীতি পরায়ণ, একমাত্র আমিই ঈশ্বরপ্রেরিত দূত। একদিকে, নিজেই নিজের ঢাক পিটিয়ে যাওয়া। অন্যদিকে, বিরোধীদের চূড়ান্ত নোঙরা ভাষায় কটূক্তি করা। রাহুল গান্ধীকে 'পাপ্পু' বলে কে প্রথম সম্বোধন করেছিলেন। সোনিয়া গান্ধীকে 'পাপ্পু কি মা' কে বলেছিলেন? এই আক্রমণ এসেছিল একেবারে সর্বোচ্চ জায়গা থেকে। আর কোনও প্রধানমন্ত্রীকে এমন নিকৃষ্ট আচরণ করতে দেখা যায়নি।

সম্মান পেতে গেলে তার যোগ্য হয়ে উঠতে হয়। প্রধানমন্ত্রীর পদটা অবশ্যই সম্মানের। এই চেয়ারে আসীন ব্যক্তিকে নোঙরা আক্রমণ কখনই কাম্য নয়। কিন্তু যিনি চেয়ারে বসছেন, তিনি নিজেই যদি চেয়ারের সম্মান না বোঝেন, অন্যরা বুঝবে, এতখানি আশা করাটা একটু বাড়াবাড়ি। তাঁর চেয়ারের সম্মান নষ্ট করার জন্য তিনি নিজেই যথেষ্ট। কোনও বিরোধীর দরকার নেই, কোনও ছাত্রসমাজেরও দরকার নেই।

কেউ তো আপনার কাছে ক্ষমা চায়নি। তাই অযাচিত 'ক্ষমা করে' মহান হওয়ার দরকার নেই। বরং, নিজের ভাষণ মন দিয়ে শুনুন। কথায় কথায় পণ্ডিত হেররু ও অন্যান্য প্রধানমন্ত্রীদের কী ভাষায় আক্রমণ করেছেন, নিজেই শুনুন। তারপর মনে মনে ক্ষমা চেয়ে নিন।

কুণাল বদলাননি, বদলেছে তাঁকে দেখার চোখগুলো

হরিশ মুখার্জি

কুণাল ঘোষকে নিয়ে বাঙালির রাজনৈতিক স্মৃতি বেশ বিচিত্র। একটা সময় তাঁকে দেখলেই যেন বিতর্কের গন্ধ পাওয়া যেত। সাংবাদিক হিসেবে পরিচিতি, পরে তৃণমূলের সক্রিয় রাজনীতি—সব মিলিয়ে তিনি ছিলেন এমন এক চরিত্র, যাঁকে নিয়ে মতামত ছিল প্রবল, কিন্তু নিরপেক্ষতা ছিল কম।

কুণাল কিছু বললেই সামাজিক মাধ্যমে ঝড় উঠত। তাঁর পোস্টের কমেন্ট বক্সে যুক্তির পাশাপাশি গালাগালি, ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ—সবই থাকত। বিরোধীদের আক্রমণ করেছেন, আবার নিজের দলকেও সব সময় ছাড় দেননি। ফলে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে সমালোচনা যেমন হয়েছে, তেমনই তাঁকে নিয়ে তৈরি হয়েছে নানা রকম ধারণা।

কিন্তু সময় মানুষকে নতুন করে চিনতে শেখায়। ২০২৬-এর রাজনৈতিক পালাবদলের পর সেই কুণাল ঘোষকেই যেন অন্য চোখে দেখছেন অনেকে। একের পর এক নেতা শিবির বদলেছেন।

কেউ নতুন সরকারের দিকে গিয়েছেন, কেউ পুরনো অবস্থান বদলেছেন, কেউ আবার রাজনৈতিক ভবিষ্যতের হিসাব কষতে ব্যস্ত। কুণাল কিন্তু তৃণমূলেই রয়ে গিয়েছেন। নিজেই বলেছেন, সরকার বদলালেও তিনি তৃণমূলের সৈনিক ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন।

রাজনৈতিক আনুগত্যের পরীক্ষা ক্ষমতায় থাকাকালীন হয় না। তখন পাশে থাকা সহজ। আসল পরীক্ষা হয় যখন ক্ষমতা হাতছাড়া হয়, যখন চারপাশের মানুষ একে একে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে শুরু করেন। সেই পরীক্ষায় কুণাল নিজের অবস্থান বদলাননি।

এটাই তাঁর ভাবমূর্তিতে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এনেছে। যাঁরা একসময় তাঁকে তীব্র সমালোচনা করতেন, তাঁদেরই কেউ কেউ এখন বলছেন—লোকটা অন্তত বিপদের সময়ে পালাননি। এই স্বীকৃতির মূল্য কম নয়। কারণ,

এমনকি দলের সঙ্গে মতবিরোধেও তিনি আগের মতোই সরব। অর্থাৎ আনুগত্য মানে তাঁর কাছে সব বিষয়ে চুপ করে থাকা নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি তাঁর রাজনৈতিক আনুগত্যের কথা তিনি যেমন প্রকাশ্যে বলেছেন,

তেমনই দলের ভুল নিয়েও নিজের মত জানিয়েছেন। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও এই দ্বৈত চরিত্রটি দেখা যাচ্ছে। এখানেই হয়তো পুরনো কুণাল আর নতুন কুণালের পার্থক্য।

আগে তাঁর কথা শুনলে অনেকের মনে হত—এই মানুষটি কি শুধুই দলীয় আক্রমণের মুখ? এখন অনেকে তাঁর মধ্যে দেখছেন অন্য কিছু—একজন রাজনৈতিক কর্মীর জেদ। ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে বেলেঘাটা থেকে তাঁকে প্রার্থী করেছিল তৃণমূল। প্রচারে নিজের পোস্টার পর্যন্ত ছিঁড়ে দিয়ে দলের কর্মীদের 'বাড়তি উৎসাহ' না দেখানোর বার্তা দিয়েছিলেন তিনি।

তারপর বিধানসভাতেও তাঁর পুরনো স্বভাব বদলায়নি। কথা বলেছেন জোরে, বিতর্কে জড়িয়েছেন, এমনকি এক পর্যায়ে মার্শাল ডেকে তাঁকে বিধানসভা থেকে বার করে দেওয়া হয় এবং দিনের জন্য সাসপেন্ডও করা হয়। অর্থাৎ কুণাল বদলেছেন, আবার বদলাননি। বদলেছে তাঁকে দেখার চোখ।

একসময় যে মানুষটির প্রতিটি বক্তব্যকে সন্দেহের চোখে দেখা হত, এখন তাঁর সম্পর্কে অন্য একটি কথা শোনা যাচ্ছে—'লোকটা অন্তত ধান্দাবাজ নয়।' রাজনীতিতে এই সার্টিফিকেট পাওয়া সহজ নয়। কুণালের পুরনো বিতর্ক মুছে যায়নি। তাঁর রাজনৈতিক অতীতও নতুন করে লেখা সম্ভব নয়। কিন্তু রাজনীতিতে চরিত্রের একটি পরীক্ষা আছে, যার নাম—'বিপদের সময় পাশে থাকা।'

সেই পরীক্ষায় কুণাল আপাতত পাশ করেছেন বলেই হয়তো তাঁর কমেন্ট বক্সের ভাষাও বদলে গেছে। যেখানে আগে থাকত কটাক্ষ, এখন সেখানে অনেক সময় প্রশংসা। এ যেন রাজনীতির এক অদ্ভুত পরিহাস। যে মানুষটি এত দিন অন্যদের আক্রমণ সামলেছেন, তিনিই এখন প্রশংসা সামলাচ্ছেন।

তিনি এখনও বিতর্কিত, এখনও তীক্ষ্ণ, এখনও বেপরোয়া। কিন্তু একটা জিনিস তিনি প্রমাণ করেছেন—সবাই যখন নিরাপদ দিক খোঁজে, তখনও কেউ কেউ নিজের পুরনো ঘরটাতেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। রাজনীতিতে আনুগত্যের মূল্য নিয়ে যত প্রশ্নই থাক, এই দৃশ্যটি অন্তত মনে রাখার মতো। কুণালের সবচেয়ে বড় পরিবর্তন তাই হয়তো তাঁর মধ্যে নয়। পরিবর্তনটা ঘটেছে তাঁকে দেখার চোখে।

‘জাস্টিস ফর আর জি কর’ কোথায় হারিয়ে গেল?

রক্তিম মিত্র

দু’বছর আগে কলকাতার রাজপথে একটি স্লোগান উঠেছিল—‘জাস্টিস ফর আর জি কর’।

স্লোগানটি খুব দ্রুত কলকাতার সীমানা পেরিয়ে দেশের নানা প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। চিকিৎসক, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, শিল্পী, সাধারণ মানুষ—রাজনৈতিক পরিচয় ভুলে বহু মানুষ পথে নেমেছিলেন। কোনও রাজনৈতিক দলের ডাকে নয়, কোনও নির্বাচনী স্বার্থে নয়। এক তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যু এবং তার পরের তদন্ত নিয়ে মানুষের মনে যে ক্ষোভ ও অবিশ্বাস তৈরি হয়েছিল, তারই প্রকাশ ঘটেছিল এই গণআন্দোলনে। কলকাতা তখন গোটা দেশকে দেখিয়েছিল, অরাজনৈতিক গণআন্দোলন কাকে বলে।

আজ, দু’বছর পরে, সেই ভিড় নেই। মোমবাতির মিছিল নেই। পোস্টার নেই। সামাজিক মাধ্যমে প্রতিদিন নতুন নতুন দাবি

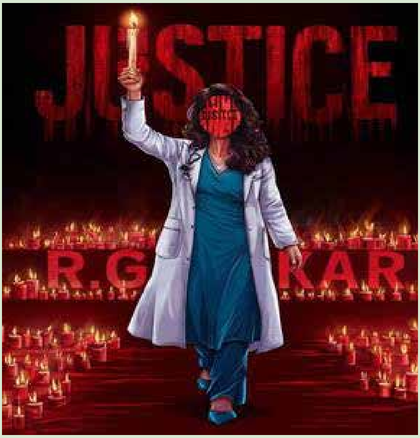

নেই। শহর নিজের ছন্দে ফিরে গিয়েছে। শুধু প্রশ্নটি রয়ে গিয়েছে।

গত দু’বছরে মামলার পথ কম ঘোরেনি। শিয়ালদহ আদালত থেকে কলকাতা হাইকোর্ট, তারপর সুপ্রিম কোর্ট—সেখান থেকে আবার লোয়ার কোর্ট। বিচারের নানা স্তর পেরিয়েছে ঘটনা। তদন্তের দায়িত্বও বদলেছে। প্রথমে রাজ্য পুলিশের তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। পরে সিবিআই তদন্তভার নেয়। একাধিক রিপোর্ট, শুনানি, আবেদন, পাল্টা আবেদন—সবই হয়েছে।

কিন্তু এত কিছুর পরেও সাধারণ মানুষের মনে যে প্রশ্নটি ছিল, সেটি এখনও মুছে যায়নি—ঘটনার সব সত্য কি সামনে এসেছে? আইনের নিজস্ব গতি আছে। আদালতের নিজস্ব প্রক্রিয়া আছে। তদন্তও নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে এগোয়। এই যুক্তি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু গণতন্ত্রে বিচার শুধু আদালতের রায়ের বিষয় নয়; মানুষের আস্থাও তার একটি বড় অংশ।

সেই আস্থাতেই সবচেয়ে বড় ধাক্কা লেগেছিল আর জি কর কাণ্ডে। কারণ, মানুষ দেখেছিল, একটি ঘটনার পর তদন্তের প্রাথমিক ধাপ নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। প্রমাণ সংরক্ষণ, ঘটনাস্থল, প্রশাসনের ভূমিকা—সব কিছু নিয়ে বিতর্ক তৈরি হচ্ছে। তারপর তদন্ত এক সংস্থা থেকে অন্য সংস্থার হাতে যাচ্ছে। আর সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। আসল অভিযুক্তরা আড়ালেই থেকে গেল। বেচারা কোন এক সিভিক ভলান্টিয়ার। রাষ্ট্র তাকে সাজা শুনিয়ে ভেবে নিল, বিরাট এক ন্যায়বিচার বুঝি প্রতিষ্ঠা হল। কিন্তু রহস্যের কিনারা তো দূরের কথা, তার একশো মাইলের মধ্যেও সিবিআই পৌঁছোতে পারেনি। তারা তদন্তের নামে শুধু সময় নষ্ট করে গেছে।

দু’বছর পরে তাই অনেকের মনে হচ্ছে, এই দীর্ঘ প্রক্রিয়া কি সত্যকে আরও স্পষ্ট করেছে, নাকি মানুষের স্মৃতিকে ধীরে ধীরে ক্লান্ত করে তুলেছে? আর জি কর কাণ্ড আরও একটি অস্বস্তিকর প্রশ্ন সামনে এনেছিল। রাজ্য সরকার হোক বা কেন্দ্রীয় সরকার—ক্ষমতার কাঠামোর প্রতি মানুষের সন্দেহ কতটা গভীর হয়েছে। রাজ্য পুলিশের তদন্ত নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠল, তখন কেন্দ্রীয় সংস্থার উপর ভরসা করা হয়েছিল। কিন্তু সিবিআই তদন্তের পরেও যদি প্রশ্ন থেকেই যায়, তাহলে মানুষ যাবে কোথায়?

এই প্রশ্নের উত্তর কোনও একটি সরকারকে নয়, গোটা বিচার ও তদন্ত ব্যবস্থাকেই খুঁজতে হবে। দু’বছর আগে অভয়ার নাম ছিল প্রতিবাদের প্রতীক। আজ সেই নাম যেন আমাদের গণতন্ত্রের স্মৃতিশক্তিরও পরীক্ষা। আমরা কি শুধু রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করতে জানি, নাকি দীর্ঘ সময় ধরে জবাবদিহি দাবি করতেও পারি? ‘জাস্টিস ফর আর জি কর’ স্লোগানটি হয়তো আজ আর তেমন শোনা যায় না। কিন্তু তার ভিতরের প্রশ্নটি এখনও মরে যায়নি।

দু’বছর পরেও যদি তদন্ত শেষ না হয়, দু বছর পরেও যদি মূল প্রশ্ন অজানাই থেকে যায়, তাহলে এমন তদন্তকারি সংস্থা আদৌ রাখার দরকার আছে কিনা, সেই প্রশ্নটাই সবার আগে তোলা উচিত। বিচারের পথ যত দীর্ঘ হয়েছে, মানুষের আস্থা ততটাই কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়েছে।

আর গণতন্ত্রে বিচার বিলম্বিত হলে শুধু একটি মামলাই দীর্ঘ হয় না, দীর্ঘ হয় মানুষের অপেক্ষাও। মানুষ অনেক সংযম দেখিয়েছে। এবার বিচার বিভাগকেও আয়না দেখানোর সময় এসেছে।

গল্প

চেনা মুখ অচেনা সিটং

শুভম দে

সিটংয়ে তখন কমলালেবুর মরশুম।

পাহাড়ের ঢালে ঢালে সবুজ পাতার ফাঁক দিয়ে ঝুলে আছে ছোট ছোট কমলা। দূর থেকে মনে হচ্ছে, পাহাড়ের গায়ে কেউ যেন অসংখ্য প্রদীপ জ্বেলে দিয়েছে। সকালের রোদে তাদের গায়ে একটা মিষ্টি হলুদ আলো। বাতাসে কমলালেবুর গন্ধ মিশে আছে। ভোরের দিকে কুয়াশা এসে গাছপালাকে ঢেকে দেয়, আবার একটু বেলা হলেই সবকিছু পরিষ্কার।

অনিকেতের বয়স বাইশ। সদ্য বিটেক শেষ করেছে। কলেজের চার বছরের ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলতে বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে সিটংয়ে। পাঁচজনের দল। সারাদিন ঘোরাঘুরি, আড্ডা, ছবি তোলা, রাতে গান—এই ছিল পরিকল্পনা।

প্রথম দিন দুপুরে হোমস্টের বারান্দায় দাঁড়িয়ে পাহাড় দেখছিল অনিকেত। হাতে মোবাইল। হঠাৎ সামনের রাস্তা দিয়ে একটা পরিবারকে যেতে দেখে তার চোখ আটকে গেল।

মেয়েটাকে চিনতে তার কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল।

রিয়া।

স্কুলের রিয়া।

একই বেঞ্চে বসা নয়, কিন্তু একই ক্লাসে পড়ত। একই স্কুলের করিডর, একই প্রার্থনার মাঠ, একই টিফিনের ঘণ্টা—কত বছর আগের কথা! তারপর উচ্চমাধ্যমিকের পর দুজনের রাস্তা আলাদা হয়ে গিয়েছিল।

অনিকেত ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে চলে গেল। রিয়া বাংলা নিয়ে পড়তে শুরু করল। এখন মাস্টার্স করছে।

রিয়াকে সামনে দেখে অনিকেতের প্রথম যে কথাটা মনে হল, সেটা খুব অদ্ভুত—

'মেয়েটা এত বদলে গেল কবে?'

তারপরই নিজের মনে হাসল। মানুষ কি একই রকম থাকে?

রিয়াও তাকে দেখে চিনে ফেলেছিল।

'এই! অনিকেত?'

'হ্যাঁ। তুই?'

'আমি না হলে কে?'

দুজনেই হেসে ফেলেছিল।

সঙ্গে রিয়ার বাবা-মা আর ভাই। অনিকেতের বন্ধুরাও তখন এসে দাঁড়িয়েছে। ফলে স্কুলের পুরনো গল্পের জায়গায় হল কেবল কয়েকটা সাধারণ প্রশ্ন।

'কোথায় উঠেছিস?'

'ওই যে, একটু সামনে। তোরা?'

'আমরাও এই দিকেই।'

'কতদিন?'

'দুদিন।'

'আমরাও।'

তারপর আবার হাসি।

কথা শেষ।

কিন্তু কথাটা যেন শেষ হল না।

সেদিন রাতে অনিকেত বিছানায় শুয়ে ফেসবুক খুলল। রিয়ার প্রোফাইল অনেক দিন ধরেই তার পরিচিত। রিয়ার লেখা সে পড়ে। বিশেষ করে ভ্রমণ নিয়ে লেখা। কোথাও গেলে রিয়া শুধু জায়গার ছবি দেয় না—কোনও গন্ধ, কোনও পুরনো স্মৃতি, কোনও মানুষের মুখ, কোনও হারিয়ে যাওয়া বিকেলের কথা জুড়ে দেয়।

অনিকেত মাঝে মাঝে ভাবত, এত কিছু একটা

মানুষ কীভাবে দেখে?

রিয়াও অনিকেতের ছবি দেখে। পাহাড়, সমুদ্র, ট্রেকিং, পুরনো বাড়ি, রাস্তার ধারে চায়ের দোকান—সবই। আর অনিকেত মাঝে মাঝে গান গায়। গিটার হাতে বসে কোনও পুরনো বাংলা গান গেয়ে ভিডিও আপলোড করলে রিয়া সেটাও দেখে।

কেউ কাউকে লাইক দেয় না।

একবারও না।

এটা নিয়ে দুজনেরই যেন একটা অদৃশ্য চুক্তি আছে।

দেখবে। কিন্তু জানাবে না যে দেখেছি।

পরদিন সকালে অনিকেতদের দল কমলালেবুর বাগানে গিয়েছিল। গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছিল সবাই। হঠাৎ দূরে রিয়াকে দেখা গেল।

রিয়া একা।

হাতে একটা কমলালেবু।

অনিকেত এগিয়ে গিয়ে বলল, ‘কী ব্যাপার? পরিবার কোথায়?’

‘ওরা ওপরে গেছে। আমি একটু ছবি তুলছিলাম।’

‘তুই এখনও ছবি তুলিস?’

‘ছবি তো সবাই তোলে। আমি একটু অন্যরকম তোলার চেষ্টা করি।’

‘ও! সাহিত্যিক উত্তর।’

‘তুই এখনও আগের মতোই বোকা।’

‘আর তুই?’

‘আমি আরও বোকা হয়েছি।’

দুজনেই হেসে ফেলল।

এই প্রথম একটু বেশি সময় কথা হল।

রিয়া বলল, ‘তোর গানগুলো শুনি।’

অনিকেত থমকে গেল।

‘শুনিস?’

‘হ্যাঁ।’

‘কেমন লাগে?’

‘মোটামুটি।’

‘মোটামুটি মানে?’

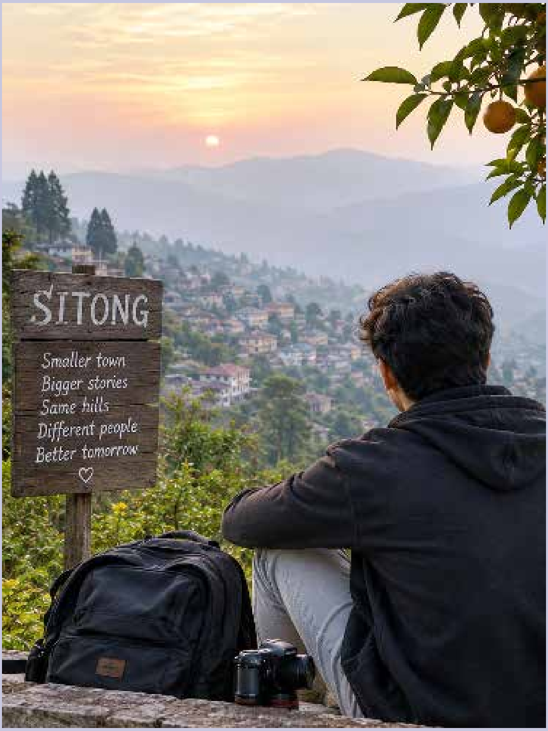

'কখনও বলিসনি তো।'

'তুইও তো বলিসনি।'

দুজনের চোখে চোখ পড়ল।

কী একটা কথা যেন মাঝখানে এসে দাঁড়াল। কিন্তু কেউ বলল না।
দূর থেকে রিয়ার মা ডাকলেন।

'রিয়া!'

'যাই।'

'হ্যাঁ।'

'মানে, খুব ভালো বললে তুই মাথায় উঠে যাবি।'

অনিকেত হাসল।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তোর লেখাগুলো আমিও পড়ি।'

এবার রিয়া চুপ।

'সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

'আবার দেখা হবে।'

অনিকেত কথাটা শুনে হঠাৎ মনে মনে বলল—'হবে তো?'

কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

দুপুরের পর বন্ধুরা যখন অন্যদিকে ঘুরতে বেরোল, অনিকেত একবার ভাবল রিয়াকে মেসেজ করবে—'কোথায় আছিস?'

তারপর নিজেই থেমে গেল।

এত বছর পরে হঠাৎ?

যদি অস্বস্তি হয়?

যদি ভাবে, এতদিন যোগাযোগ নেই, এখন আবার কেন?

অনিকেত মোবাইলটা পকেটে ঢুকিয়ে দিল।

দুদিন খুব দ্রুত কেটে গেল।

সকালে অনিকেতদের দল সিকিমের দিকে রওনা দিল। গাড়িতে বসে বন্ধুরা হৈচৈ করছে। কেউ গান চালিয়েছে, কেউ ছবি তুলছে। পাহাড় পিছিয়ে যাচ্ছে।

অনিকেত জানলার বাইরে তাকিয়ে রইল।

কমলালেবুর গাছগুলো একে একে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

ঠিক তখনই ফোনে একটা নোটিফিকেশন এল।

রিয়া একটা নতুন ছবি পোস্ট করেছে।

সিটংয়ের পাহাড়। সামনে কয়েকটা কমলালেবু। ছবির নিচে লিখেছে—

‘কিছু জায়গা থেকে ফিরে আসা যায়, কিন্তু জায়গাগুলো থেকে ফেরা যায় না।’

অনিকেত অনেকক্ষণ পোস্টটার দিকে তাকিয়ে রইল।

তার মনে হল, কথাটা শুধু সিটংকে নিয়ে নয়।

হয়তো তাদের স্কুলের দিনগুলো নিয়েও।

হয়তো দুজনের মাঝখানে পড়ে থাকা এতগুলো বছর নিয়েও।

অনিকেত লাইক দিল না।

কমেন্টও করল না।

কিন্তু এবার আর ফোনটা পকেটে ঢোকাল না।

ফেসবুক বন্ধ করে হোয়াটসঅ্যাপ খুলল।

রিয়ার নামটা এখনও আছে।

শেষ কথা হয়েছিল—কত বছর আগে?

মনে পড়ল না।

টাইপ করল—

‘শিলিগুড়ি পৌঁছেছিস?’

লিখে থেমে গেল।

মুছে দিল।

আবার লিখল—

‘সিটং কেমন লাগল?’

এটাও খুব সাধারণ।

মুছে দিল।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থেকে লিখল—

‘সিটং থেকে ফেরার পর মনে হচ্ছে, দুদিনে অনেক কিছু বলা হয়নি।’

এবার আর মুছল না।

কিন্তু সেন্ড করার সাহস হল না।

গাড়ি তখন পাহাড়ি রাস্তা ছেড়ে একটু সমতলের দিকে নামছে। বন্ধুরা কেউ খেয়াল করছে না অনিকেতের দিকে।

হঠাৎ ফোনটা কেঁপে উঠল।

রিয়ার মেসেজ।

‘তোরা সিকিম পৌঁছেছিস?’

অনিকেত কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল।

তারপর হাসল।

একটা ছোট্ট হাসি।

যে হাসির কোনও সাক্ষী নেই।

সে লিখল—

‘না। পথে। তুই?’

ওপাশ থেকে উত্তর এল—

‘আমরা শিলিগুড়ির দিকে।’

অনিকেত লিখল—

‘ফিরে গিয়ে আবার কথা হবে?’

কয়েক সেকেন্ড কোনও উত্তর নেই।

তারপর—

‘হবে।’

আর একটু পরে আরেকটা মেসেজ এল।

‘এবার লাইক দেওয়ার বদলে মাঝে মাঝে কথা বলিস।’

অনিকেত ফোনের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রইল।

বাইরে পাহাড় তখনও পিছিয়ে যাচ্ছে।

কমলালেবুর মরশুম শেষ হয়নি।

শুধু সিটং থেকে তাদের দুজনের ফেরার পালা।

হয়তো গল্পটার শুরু এবার।

আর্জেন্টিনার কাছে শিল্পই চাই, গুন্ডামি নয়

সৃজন শীল

আচ্ছা, এত এত দেশ থাকতে বাঙালি ব্রাজিল বা আর্জেন্টিনার ভক্ত হল কেন? বাংলার পাড়ায় পাড়ায় এই দুই দেশের পতাকা কেন? নিজের দেশ বিশ্বকাপের ত্রিসীমানায় নেই, ভিন মহাদেশের দুই দেশ নিয়ে এত মাতামাতি কেন? সমর্থনের জন্য দেশ কি কম পড়িয়াছে! ইওরোপের এত এত দেশ ছিল। এশিয়ারও বেশ কিছু দেশ বিশ্বকাপে খেলে। তবু খামোখা ব্রাজিল বা আর্জেন্টিনা কেন?

শুধু বাঙালি বলছি কেন? সারা বিশ্বেই তো ব্রাজিল বা আর্জেন্টিনা অনুরাগীর ছড়াছড়ি। এমনকী যে দেশগুলো খেলছে, তাঁরা নিজের দেশের খেলার সময় নিজের দেশকে সমর্থন করে ঠিকই, কিন্তু নিজের দেশ ছিটকে গেলে তারাও তো ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনায় ভাগ হয়ে যায়।

আসল কথা হল, শিল্প, ঘরানা। এই দুই

দেশের খেলায় এমন কিছু আমরা প্রত্যাশা করি, যে প্রত্যাশা আমাদের রাত জাগিয়ে রাখে। যে প্রত্যাশা আমাদের কাকভোরে তুলে দেয়। আর্জেন্টিনা যখন পিছিয়ে পড়ে, মনে হয়, একজন মেসি আছেন। তিনি শেষ পাঁচ মিনিটে ঠিক খেলা ঘুরিয়ে দেবেন। তাই দিয়েওছেন। দুরন্ত কোনও পাস, দুরন্ত কোনও ফ্রিকিক নিমেশে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু ফাইনালে এ কোন আর্জেন্টিনাকে দেখলাম? লিওনেল স্কালোনি নিঃসন্দেহে বড় মাপের কোচ। তাঁর নানা কৌশল ও

স্ট্র্যাটেজি রয়েছে। কিন্তু এ কেমন কৌশল যেখানে নিজেদের স্বাভাবিক ঘরানাকে ছুঁড়ে ফেলে নেতিবাচক এক ঘরানাকে আঁকড়ে ধরতে হয়। অন্যান্য ইউরোপীয় দলের মতো আর্জেন্টিনা যে বিপক্ষকে থামাতে বেশি ব্যস্ত রইল। শুরু থেকেই মারামারি, ধাক্কাধাক্কির রাস্তায় চলে গেল। অকারণে ফাউল করে ম্যাচকে বিরক্তিকর জায়গায় নিয়ে গেল। এই আর্জেন্টিনাকে চিনি না, চিনতেও চাই না। নিজেদের স্বাভাবিক খেলা তুলে ধরার বদলে ধাক্কাধাক্কি করে অন্যের খেলা নষ্টের চেষ্টাতেই বেশি সময় ও মনোযোগ দিল। নব্বই মিনিটে একটাও গোলমুখী শট নেই, ভাবা যায়! এমনকী একশো কুড়ি মিনিটেই বা কটা বল বিপক্ষের গোলপিকাপের হাতে পৌঁছেছে! মেসি কার্যত দাঁড়িয়ে থেকেছেন। তাঁর দিকে বল বাড়ানোর লোক নেই। কারণ, সবাই নীচে নেমে ধাক্কাধাক্কিতে ব্যস্ত।

চিরকাল দেখে এসেছি, আর্জেন্টিনাকে থামাতে অন্যরা ফাউল করছে। এবার দেখলাম, অন্যের খেলা ধ্বংস করতে আর্জেন্টিনা ফাউল করতে শুরু করেছে। সারাক্ষণ নীতে নেমে অন্য দলকে আটকাতে ব্যস্ত থাকছে। তাও আবার ফাইনালে।

কথায় আছে, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়, পরোধর্ম ভয়াবহ। লিওনেল স্কালোনি যদি এই সার কথাটা বুঝতেন! আর্জেন্টিনার কাছ থেকে শিল্পই দেখতে চাই, গুন্ডামি নয়। তাই এই আর্জেন্টিনা ট্রফি না পাওয়ায় সত্যিই কোনও দুঃখ নেই।

এত দেমাক কীসের কাঞ্চনজঙ্ঘার?

অন্তরা চৌধুরি

মাটিতে পা পড়ছে না। কাঞ্চনজঙ্ঘার ব্যাপারটাও ঠিক সেই রকম। যেহেতু সারা বছর তাকে দেখতে লক্ষ লক্ষ লোক পাহাড়ে যাচ্ছে, তাই তার এত দেমাক। ইচ্ছে হলে উনি দেখা দেবেন। না হলে মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়ে বসে থাকবেন। এদিকে যাঁরা এত হাজার হাজার টাকা খরচা করে পাহাড়ে গেলেন, কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখতে না পেয়ে তাঁরা হতাশ হয়ে মনের দুঃখে ফিরে আসছেন।

পাহাড়ে যাঁরা বেড়াতে যান তাদের মধ্যে বেশ কয়েকটি কমন প্রশ্নের মধ্যে একটি হল, ‘আপনারা কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পেয়েছেন?’ লক্ষ করে দেখেছি ‘হ্যাঁ’ বললে উল্টোদিকের ব্যক্তি দুঃখ পায়। আর ‘না’ বললে অদ্ভুত আনন্দ পায়। আর ঠিক এই সুযোগটাই কাজে লাগায় আমাদের কাঞ্চনজঙ্ঘা। শীতকালে যদিও তাঁর

দেখে মেলে, গরমকাল বা বর্ষাকালে তো কথাই নেই। সারাক্ষণ মেঘ আর বৃষ্টি। একসময় বৃষ্টি বন্ধ হয়ে ঝকঝকে রোদও ওঠে। কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখার কোনও আশা নেই। আচ্ছা সব মানুষ কি শীতকালে বেড়াতে যেতে পারে! সেই সময় ছুটিছাটা কোথায়! গরমকালেই তো ঠান্ডার জায়গায় যাওয়ার মজা। তীব্র গরমে সমতলবাসীর যখন নাজেহাল অবস্থা, তখন পাহাড়বাসী দিব্বি গায়ে সোয়েটার, জ্যাকেট, টুপি, মোজা চাপিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আগে খুব ভাল লাগত। যতবারই পাহাড়ে গিয়েছি পাঁচদিন, ছ'দিন ধরে তার দর্শন পাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছি। হয়তো ঠিক ফেরার দিন অতিরিক্ত কৃপণের মতো সবাইকে একটু 'গুডমর্নিং' জানিয়ে আবার মুখ লুকিয়ে ফেলল। এই সব অসভ্যতাগুলো অনেক বছর ধরে সহ্য করেছি। কিন্তু আর নয়। তাই এবারে আমিও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম। কাঞ্চনজঙ্ঘা ছাড়াও পাহাড়ে আরও অনেক কিছু দেখার আছে। উপভোগ করার আছে। তাই তাকে দেখা গেল বা না গেল সেই নিয়ে হাপিত্যেশ করিনি। সবাই আসলে এই কাঞ্চনজঙ্ঘাকে অতিরিক্ত প্রায়োরিটি দিয়ে দিয়েছে। এতটা গুরুত্বও আবার সে ডিসার্ভ করে না।

পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়া অধিকাংশ মানুষের মধ্যে একটা আদিখ্যেতা লক্ষ করেছি। হোমস্টে হোক বা হোটেল, বুকিং করার সময় আগেই একটা প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা এই সময় কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাবে?' যেন ওই একটা শখের পাহাড় দেখা ছাড়া আর কিছু দেখার নেই।

আর যখনই কেউ কারও দুর্বল জায়গাটা জানতে পারে, তখন সেই পয়েন্টেই বেশি করে আঘাত দেয়। সে মানুষই হোক বা পাহাড়। পাহাড়ে বেড়াতে আসা সব মানুষের ফ্যান্টাসি হোক বা সফট কর্নার, সেটা কাঞ্চনজঙ্ঘা। আর সেই কারণেই নিজেকে লুকিয়ে রেখে দর্শনার্থীদের মনে আঘাত দিয়ে এক ধরণের বিকৃত আনন্দ পায় এই কাঞ্চনজঙ্ঘা। কিন্তু তার কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে। ভক্তই যদি না থাকে, তাহলে ভগবানের পুজো হবে কেমন করে? রূপের ওই প্রদীপ জ্বেলে কী হবে তোমার যদি কেউ না থাকে দেখার!

তবে হ্যাঁ। মন ভরে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখে ছিলাম ঝান্ডি থেকে। সেবারে আমি আর আমার কর্তা বেড়াতে গিয়েছিলাম ঝান্ডি। সেদিন ছিল পূর্ণিমার রাত। অস্বাভাবিক ঠান্ডার চোটে তিন–চারখানা ব্ল্যাঙ্কেট নিয়েও শীত কাটছে না। ঘুমও আসছে না। কী মনে হল বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। মনে মনে ভাবলাম পূর্ণিমা রাতের এই মায়াবি জ্যোৎস্নায় হিমালয়ের নিস্তব্ধতা অনুভব করব। দরজা খুলে চোখটা একটু ধাতস্থ হতেই দেখি সামনেই কাঞ্চনজঙ্ঘা। চাঁদের রুপোলি আলো পড়ে বরফের চূড়াগুলো ঝকঝক করছে। কী অপরূপ তার সেই রূপ! মনে হচ্ছিল যেন কী অপার বিস্ময় লুকিয়ে আছে ওই পাহাড়ে। কর্তাকে ঘুম থেকে তুললাম। সে-ও সাক্ষী রইল ওই মাহেন্দ্রক্ষণের। সেই মুহূর্তে কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপ ও রঙ প্রকাশ করার কোনও ভাষা নেই। মনে হয়েছিল এমন পাহাড়েরই তো অহঙ্কার করা সাজে। অহঙ্কার করতে গেলে যোগ্যতা লাগে। আর এই পাহাড়ের সেটা আছে বলেই সে নিজের আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। নিজেকে সহজলভ্য করে ফেলেনি বলেই তো আদি অনন্তকাল ধরে মানুষ হিমালয়ে ছুটে যায়। ছুটে যায় তাকে একটিবার দেখার আশায়। মানুষের ভালবাসার এমন মণিহার তো তারই সাজে।

স্নিগ্ধ গ্রাম কোলাখাম

মেঘের চিঠি বয়ে বেড়ানো এক খাম। শান্ত, সুন্দর, স্নিগ্ধ গ্রাম— কোলাখাম। হুল্লোড় নেই, আছে অনাবিল শান্তি। এমন নিরালায় অলসভাবে কাটিয়ে দেওয়া যায় কত মুহূর্ত। ফিরে এসে লিখলেন **সুব্রত মণ্ডল**।

স্কুলের পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ায় তড়িঘড়ি কোলাখাম যাব ঠিক করলাম। জায়গাটার কথা আগেও শুনেছি। কয়েকটা ভিডিও দেখে কিছু প্রাথমিক ধারণাও হয়েছে। আসলে, আমার কাছে পাহাড় মানেই দার্জিলিং নয়। এইসব পাহাড়ি গ্রাম আমাকে আরও বেশি করে টানে।

রাতের ট্রেনে টিকিট পাওয়া বেশ ঝামেলার। নতুন ট্রেন বন্দে ভারত জিন্দাবাদ। রিজার্ভেশন পেতেও সমস্যা হল না। জোগাড় করলাম হিমালয়ান ওডিসির বুকিং। কথা হল কো-ওনার অনিরুদ্ধ সুরের সঙ্গে। সেইমতো কেয়ারটেকার কুমার রাই আমাদের জন্য কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউ একটা রুমের ব্যবস্থা করলেন। চার দিনের পিকআপ, ড্রপ ও সাইট সিয়িংয়ের জন্য একটা গাড়ি প্যাকেজে করে নিলাম। বিরু তামাং কোলাখামেরই ছেলে। চার দিনের প্যাকেজ ও ১৩ হাজার টাকায় করে দেবে ঠিক হল। বন্দে ভারত দেড়টা নাগাদ এনজিপি পৌঁছাল।

বিরু তামাং স্টেশনেই অপেক্ষা করছিল। ট্রেনের মধ্যেই লাঞ্চ হয়ে গেছিল। আমরা সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি চেপে বসলাম। গাড়ি তিস্তা ব্যারেজ, গজলডোবা, ডামডিং এমবিওক হয়ে লাভার রাস্তা ধরল। রাস্তায় ডুয়ার্সের জঙ্গল আর বেশ কিছু চা-বাগান চোখে পড়ল। একটু রোদ, একটু মেঘলা, একটা অদ্ভুত ভাল লাগার আবেশ যেন আমাদের ছুঁয়ে যাচ্ছে। এই পাহাড়, জঙ্গলের

সান্নিধ্য সত্যিই মানুষকে অনেক বেশি উদার করে তোলে। কোনও রাগ নেই, বিরক্তি নেই, হতাশা নেই, শুধুই একরাশ ভাল লাগা। লাভা পৌঁছানোর ঠিক আগে নেওড়াভ্যালির ভিতরে চেকপোস্ট ক্রস করে আমরা জঙ্গলের রাস্তা ধরলাম। এখান থেকে কোলাখাম সাত কিলোমিটার রাস্তা। জায়গায় জায়গায় একটু ভাঙাচোরা। কিন্তু আশপাশের রোমাঞ্চ এতটাই যে সেই ভাঙাচোরা রাস্তায় এতটুকুও বিরক্তি এল না।

সন্ধ্যে নামার ঠিক আগে পৌঁছে গেলাম কোলাখাম গ্রামে। এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন হোমস্টে। তার মধ্যে ক্যাসিরো ইন, দ্য নেস্ট, স্টার হলিডেজ, দ্য ট্রেল্‌স এই হোমস্টে গুলো উল্লেখ-যোগ্য। হোমস্টে হিমালয়ান ওডেসির ব্যালকনি থেকে সামনের উপত্যকা চমৎকার দেখা যায়। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে সামনের কাঞ্চনজঙ্ঘা কাল দেখা যাবে। এখানে বসে থাকলে মনে হয়, অলসভাবে সময় বয়ে যাক। মনে হয়, আমার আর কোথাও যাওয়ার নেই, কিচ্ছু করার নেই। হোমস্টের ঘরোয়া খাবার আমাদের সত্যিই তৃপ্ত করেছিল। এই যেমন হাতে গড়া রুটি, চিকেন, সবজি, ডাল আলু-পরোটা, চা। বৃষ্টি হলেই আবার এখানে কারেন্ট চলে যায়। হোমস্টের কোনও রুমে টিভি নেই। একদিক থেকে ভালই হয়েছে। নাই বা দেখলাম টিভি। টানা ব্রেকিং নিউজ থেকে অন্তত কয়েকদিনের বিরতি। মেঘ রোদ্দুরের সঙ্গে গল্প করতে করতে কয়েকটা দিন কেটে যাবে। আর লিখব ডায়েরি। সঙ্গী আছে কিছু বই। রাতের খাবার খেয়ে একটু বাইরে এসে দাঁড়ালাম। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে, তার মাঝে ব্যালকনি জুড়ে বিভিন্ন ফুল আর অর্কিডের বাহার অসাধারণ লাগছিল।

পরের দিন আকাশ ভালই ছিল। খুব ভোরে উঠে পড়লাম কিছু ছবি তুলব, আর গ্রাম ছেড়ে পাইন গাছের জঙ্গলের দিকে রাস্তা ধরে কিছুটা দূর হেঁটে আসব বলে। কিছুটা দূরে যেতেই গ্রামের চতুষ্পদেরা আমাদের সঙ্গী হল। যতদূর হেঁটে গেছি ওরা আমাদের সঙ্গ ছাড়েনি। আবার যখন ফিরছি তখনও ওরা সঙ্গেই ছিল। ফিরে এসে বেলার দিকে বেড়িয়ে এলাম লাভা, নোকদাঁড়া,

রিশপ আর টিফিনদাঁড়া ভিউ পয়েন্ট। মূল রাস্তা থেকে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে প্রায় কিলো মিটার খানেক পথ একটা ছোটখাটো ট্রেক হয়ে। আমাদের সঙ্গে ছোট ছেলে ও মেয়েও বেশ উপভোগ করতে লাগল।

রাতে বৃষ্টি নামল। সকালে কিছুটা পরিষ্কার। পৌঁছে গেলাম ছাঙ্গে ফলস। সেখান থেকে উপরে উঠে এসে নেওড়া ভ্যালির ভিতর দিয়ে রাচেলা টপ গেলাম। রাস্তাটা বেশ এবড়ো খেবড়ো। লাভা বাজারের বিজয়কুমার তার বোলেরো গাড়িতে করে আমাদের রাচেলা টপে নিয়ে গেল। উপরে উঠে সম্মোহিতের মতো অনেকক্ষণ কাটালাম। শুধু মেঘ আর কুয়াশা। দূরে পর্বতের দর্শন তাই হল না। লাভা ফিরে এলাম। পথের ধারে লাভা বাজারের মুখে লামু ফুড সেন্টারে গরম গরম ওয়াই ওয়াই, চিকেন মোমো আর নুডলস খেলাম। তারপর গেলাম মনাস্ট্রি। চারটের সময় প্রার্থনা শুরু হল। এই প্রথম মোনাস্ট্রির ভিতর ছোট-বড় নানান বয়সী লামাদের সঙ্গে পুরো প্রার্থনা পর্ব উপভোগ করলাম।

রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। পাশের রুম থেকে কর্ণবিদারক আওয়াজ ভেসে আসছে... ও সাকিরে, সাকিরে সাকি.... বুঝলাম
কালরাত্রে যে চারজন মেয়ে এই হোমস্টেতে এসে উঠেছে, তারাই আনন্দ ফুর্তি করছে। রাত্রির নিস্তব্ধতা নির্জনতাকে খানখান করে দিচ্ছিল শহুরে এই মেজাজ। কিছুটা রাগই হচ্ছিল। এরা কেন এই শান্ত গ্রামে আসে। এটা যে হুল্লোড় করার জায়গা নয়, এটুকুও বোঝে না! কাল রাত্রে আরও একজন বয়স্ক কাপল এই হোমস্টেতে এসেছেন। তাঁদের কথা ভেবেও খারাপ লাগছিল। কোলাখাম বিখ্যাত অসংখ্য পাখির গুঞ্জনের জন্য। বোধহয় তারাও এই রাত্রে ঘুমোতে না পেরে বিরক্ত।

ভ্রমণ শেষে পরের দিন পাহাড়জুড়ে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। সেরা সঞ্চয় হয়ে থাকবে হোম-স্টের সামনে কুমার রাই ও তার পরিবারের সঙ্গে আমাদের ছবিখানা। অনেক অভিজ্ঞতা আর ভাল লাগার আবেশ নিয়ে ফেরার রাস্তা ধরলাম।

বেঙ্গল টাইমস

৮ আগস্ট, ২০২৬

ওয়েবসাইট
bengaltimes.in

ISBN
ISBN 2445 5657
2445 5657

বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন।
সম্পাদকীয় কার্যালয়: কেবি ১২, সেক্টর ৩, সল্টলেক, কলকাতা ১০৬।
ফোন ৯৮৩১২২৭২০১, ই মেল bengaltimes.in@gmail.com
ওয়েবসাইট: bengaltimes.in

সম্পাদক: স্বরূপ গোস্বামী